ভারতে থাকা বাঙালীরা কি পরাধীন?
-বিপ্লব

সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলাদেশীদের মনোভাবটা এই রকম-তারা স্বাধীন, পশ্চিমবঙ্গের বাঙালী ভারতের কাছে পরাধীন! ব্যাপারটা শুনে প্রথম প্রথম হাঁসতাম। যেকোন ভারতীয় বাঙালীই শুনে মিচকি হেঁসে বলবে, তাহলে ভারতীয় কারা? যাইহোক, মনে হচ্ছে ছোটবেলা থেকে বাঙলাদেশে এমটাই শেখানো হয়, তাই এই হাস্যকর ইমোশনাল ফলস প্রাইড মজ্জাগত হয়ে রয়েছে।

আসুন দেখি বাস্তবটা কি?

অর্থনীতি বলে, শুধু অর্থনীতির ভিত্তিতে রাস্ট্রের উৎপত্তির ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। কারণ, একটা রাস্ট্র ভেঙে ছোট হলে মার্কেট, কাস্টমার সবই ছোট হয়ে যায়। আবার এটাও ঠিক একটা ছোট রাস্ট্রের যত দ্রুত উন্নতি সম্ভব, বড় রাস্ট্রের ক্ষেত্রে সেটা সম্ভব নয়। যদিও ভারত এবং চীনের ক্ষেত্রে আমরা উলটো পুরান দেখতে পাচ্ছি।

স্বাধীনতা বনাম যুক্তরাস্ট্রীয় ব্যাপারটা আমরা দেখবো নিম্নলিখিত দৃস্টিভংগী থেকে।

- অর্থনীতি
- বাংলা সংস্কৃতি
- বিশ্বরাজনীতিতে প্রভাব এবং বিশ্বে আমাদের ভাবমূর্তি

অর্থনীতির দিক দিয়ে যুক্তরাস্ট্রীয় কাঠামোয় ভারতীয় বাঙালীদের অনেক সুবিধা পাওয়ার কথা এবং সেটাই হয়েছে। যদিও একটা বড় সময় জ্যোতিবাবুর ভ্রান্ত নীতির জন্য আমরা পথে বসে ছিলাম। তবে তার কারণ ভারত নয়-বাঙালীর আত্মঘাতী বামপন্থী রাজনীতি।

ঢাকা এবং কোলকাতার দিকে তাকানো যাক। এই মূহুর্তে কলকাতা ভারতের অন্যতম বৃহত্তম সফটওয়ার, বিপিও এবং বায়োটেক সেন্টার হওয়ার পথে। সেদিন ইনফোসিস আসার ফলে ভারতের সমস্ত বৃহত্তম সফটওয়ার কোম্পানীগুলি এখন কলকাতায়-টিসিয়েস, উইপ্রো, আইবিম এবং কগনিজনেন্ট আগেই ছিল। কলকাতায় তারা লোক বাড়িয়েই চলেছে। ২০০৮ সাল নাগাদ কলকাতা থেকে রফতানীকৃত সফটওয়ারের পরিমান হবে প্রায় তিন বিলিয়ান ডলার বা ভারতীয় তেরো হাজার কোটি টাকা। যা বাংলাদেশের সমস্ত রফতানীর সমান। এর সাথে আমি যদি পশ্চিমবঙ্গ থেকে চা, ইস্পাত, বিপিও ইত্যাদি রফতানির পরিমান ধরি, সব মিলিয়ে বাংলাদেশের রফতানীর দেড়গুন হবে। যদিও সেটা এমন কিছু বেশী নয়। কারণ কর্নাটকের মতন একটা ছোট রাজ্য বাংলাদেশের প্রায় দশগুন রফটানী

করে। সেটা পশ্চিমবঙ্গ থেকেও হতে পারত। আমাদের মেধা, সম্পদ সবই ছিল। হচ্ছিল না ভ্রান্ত বামপন্থার জন্য।

যাইহোক যুক্তরাস্ট্র পরিকাঠামোর যে সুবিধা সেটা বাঙালী নিয়েছিল বিধান রায়ের আমলে। তারপর জ্যোতিবাবুর সময় আমরা হাতে হ্যারিকেন নিয়ে বসে ছিলাম। বুদ্ধদেব বাবু আবার সেই সুবিধাটা ব্যবহার করছেন।

যুক্তরাস্ট্রীয় কাঠামোতে থাকায় কলকাতার সুবিধাটা কি?

(১) বড় মার্কেট। ধরা যাক একটা বিদেশি কেমিক্যাল কোম্পানী ঢাকা এবং কলকাতার মধ্যে কোন এক স্থলে বিনিয়োগ করবে (এবং ধরা যাক কলকাতায় বামপন্থী উৎপাত নেই!)। কলকাতায় বিনিয়োগ মানে, তার মার্কেট ১১০ কোটি লোকের। যাদের গড় আয় ৬৬০ ডলার। বাংলাদেশে মানে ১৪ কোটি লোক, গড় আয় ৪৪০ ডলার। অর্থাৎ বাংলাদেশের মার্কেট, ভারতের ১০%।

তাহলে কোন বিদেশী কোম্পানী ঢাকায় বিনিয়োগ করবে বলুন?

সুতরাং ভারতের পাশে থাকায় বাংলাদেশে বিদেশী বিনিয়োগের ভবিষ্যত খুব উজ্জ্বল নয়। যদিও ভারতীয় পুঁজি উৎসাহ দেখাতেই পারে।

এবার ভাবা যাক, পশ্চিম বঙ্গ স্বাধীন একটা দেশ। তখন ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে ৮কোটি লোক, ৭১০ ডলার পার ক্যাপিটা বনাম ১৪ কোটি লোক, ৪৪০ ডলার গড় আয়। এক্ষেত্রে ঢাকার জেতার সম্ভাবনা বেশী।

(২) কাঁচামালের সুবিধা-ভারতের নানা প্রদেশে নানান খনিজ আছে। সুতরাং ভারতে শিল্প স্থাপন করলে, বিদেশ থেকে প্রযুক্তি ছারা প্রায় কিছুই আমদানী করতে হয় না। সেখানে বাংলাদেশে শিল্প স্থাপন করতে গেলে,অনেক কিছুই আমদানী করতে হবে। হলদিয়া, দূর্গাপূর বা খরগপুর শিল্পনগরী পাশে বিহার, উড়িষ্যার খনিজ না থাকলে হতো না।

(৩) রাজনৈতিক স্থিরতাঃ যুক্তরাস্ট্রীয় কাঠামোয় মিলিটারী এবং অর্থনীতি প্রচন্ড শক্তিশালী হয়। সেটাই চক্রব্যূহের মতন রাজনৈতিক স্থিরতা প্রদান করে।

(৪) ভারতীয় পুঁজিঃ ভারতের শেয়ার মার্কেট অনেক বড়, কারণ দেশটা বড়। এখনতো ইন্ডিয়ান শেয়ার মার্কেট বিশ্বের সবথেকে তেজী মার্কেট। সুতরাং কলকাতার পক্ষে বড় পুঁজি যতটা টানা সম্ভব, ঢাকার পক্ষে দুস্কর। টিসিয়েস বা আই বি এম সেই জন্যেই কলকাতায় এসেছে।

আত্মবঞ্চনার রাজনীতি কোলকাতা থেকে যত দ্রুত দূর হবে, কলকাতা থেকে

ঢাকার পার্থক্য আরো বাড়তে থাকবে। কারণ আর কিছুই নয়, যুক্তরাস্ট্রীয় কাঠামোর সুবিধা।

এইজন্য আমি এবং কুদ্দুস খান বারবার বলে আসছি, ভারত এবং বাংলাদেশের মধ্যে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ান এর মতন বাণিজ্য মুক্তাঞ্চল তৈরী করতে। নইলে আর কোন ভাবেই বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। ইফোরাম গুলিতে যারা ভারত বিরোধী গরম গরম ডায়ালোগ দিচ্ছে, তারা কিন্তু তাদের গর্বের স্বাধীন দেশের নাগরিকত্ব ছেরে আমেরিকা বা কানাডার নাগরিকত্ব নিয়ে বসে আছে! আর না খেতে পেয়ে ভিক্ষা করছে দেশের লোক!

আরে ভাই স্বাধীনতার আবেগে অর্থনীতি চলে না!

বাংলা সংস্কৃতিঃ

এখানে যুক্তরাস্ট্রীয় পরিকাঠামোতে ভাল মন্দ দুটো দিক ই দেখবো। সংস্কৃতি মানে সাহিত্য, গান এবং সিনেমা- এই তিন দিক দিয়ে দেখা যাক।

সাহিত্যে দুপার বাংলার ই দুরাবস্থা। সাহিত্য নিয়ে আমাদের এতো গর্ব, অথচ বাস্তব সত্যটা হচ্ছে বড় জোর দুচার জন আন্তর্জাতিক মানের বাঙালী কবি আছে। উপন্যাসিক বা ছোটগল্পকার নেই। বাংলা সাহিত্যচর্চায় ঢাকা না কলকাতা এগিয়ে, এহেন বিতর্ক, অনেকটা কে ন্যাংটো বনাম কে নেংটি পড়ে আছে এই টাইপের। সুনীল গাঙ্গুলি বা হুমায়ুন আহমেদ প্রবল জনপ্রিয় হতে পারে -কিন্তু আন্তর্জাতিক মানে টয়লেট পেপার ছারা কিছু নয়।

পশ্চিম বঙ্গে এহেন দুরাবস্থার পেছনে যুক্তরাস্ট্রীয় কাঠামোর কিছুটা হাত আছে। একদম নেই বলবো না। বাংলাটা আমরা ঠিক করে শিখি না-কারণ ও ছাই শিখে চাকরী নেই! গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মতন, ভালো স্কুলগুলো ইংলিশ মিডিয়াম। এটা যুক্তরাস্ট্রীয় কাঠামোর জন্যেই হয়েছে। তবে বাংলা সেখানে ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজ। এদের সবাই চাকরি পেয়ে বিদেশে চলে আসে- সাহিত্যচর্চাটা আর কে করবে?

সাহিত্য চর্চা প্রবল হচ্ছে গ্রাম বাংলায়। কারণ নব্য সাক্ষরের দল। পশ্চিমবাংলায় নাকি এখন ৯৩% সাক্ষর! অগুন্তি লিটল ম্যাগাজিন টিকে রয়েছে বাংলায়। আজো। কিন্তু লেখার স্টান্ডার্ড তথৈবচ। শ্রেফ ইংরেজী জানার অভাব।

ইদানিং সফটওয়ার কোম্পানীতে চাকরি নিয়ে, আমার কিছু লেখক বন্ধু কলকাতায় ফিরে গেছে। এটা আশার কথা। বিদেশে বসে এই সব গুলতানি হয়, সাহিত্য চর্চা সম্ভব নয়। বাংলা বইয়ের অভাব। তবুও ইন্টারনেট আসায় লিখতে পারছি এটাই ভাগ্যের।

বাংলাদেশে বোধ করি সমস্যাটা অন্যরকম। আমি সদালাপ বা সাতরঙে তরুন বাংলাদেশী লেখকদের লেখা থেকে যেটা বুঝেছি, তাদের ভাষা আছে। একটু বিদেশী সাহিত্য পড়া খুব দরকার ছিল। তাছারা এই ভালো ছাত্রদের বিদেশে চলে যাওয়ার ব্যাপারটাতো বাংলাদেশেও সমস্যা। লিখতে তো প্রতিভা লাগে! প্রতিভাবান বাঙালীরা ভাতের তাড়নায় বিদেশে চলে গেলে লিখবেটা কে?

সিনেমার ক্ষেত্রে ইদানিং কলকাতা কিছু আডভ্যান্টেজ পাচ্ছে। ব্যাপারটা হয়েছে হালে। অপর্না সেন, বা ঋতুপর্ণের সিনেমা গোটা ভারতে চলছে রমরমিয়ে। কারণ তারা সিনেমাটা বাংলা এবং হিন্দি দুটোতেই করছে। এই ভাবে বাংলার সিনেমা মনে হচ্ছে টিকে গেল। এটাও দেখুন সেই যুক্তরাস্ট্রীয় কাঠামোর সুবিধা। মাত্র এক কোটি টাকার বাজেট নিয়ে তো কুড়ি-ত্রিশ কোটি টাকার হিন্দি সিনেমার সাথে লড়াই করা যায় না! বাংলা সিনেমার টিকে থাকার এটাই একমাত্র গ্রহনযোগ্য ফর্মুলা। তাছারা এই ফর্মুলায় গোটা ভারত বাংলা সংস্কৃতি নিয়ে জানছে। দেবদাস বা পরিনীতাট্রাশ সিনেমা হতে পারে, কিন্তু এদের দৌলতেই বাংলার গয়নার ডিজাইন বা বাংলার শাড়ী বিরাট মাইলেজ পেয়েছে। অনেক বাঙালী ব্যবসাদার ই সেটা স্বীকার করেছেন।

এবার গানের ক্ষেত্রে আসি। গানে কলকাতা আজও ভারতে প্রথম। কুমার শানু থেকে সমস্ত বড় বড় উস্তাদদের আখরা কোলকাতা! সমস্যা একটাই -কোন গায়ক উঠলেই হালুম বলে লাফ দিয়ে বলিউড যাচ্ছে। টিকে গেলে ভালো, নইলে লাথি খেয়ে , ফিরে এসে আবার ম্যাও ম্যাও করে বাংলা গাইছে। ঢাকায় প্রতিভাবান শিল্পী অনেকেই-কিন্তু বলিউডের এক্সপোজারটা তারা পাচ্ছে না। আমার ধারণা পেলে, ঢাকার সঙ্গীতচর্চা আরো ব্যাপ্ত হতো।

বিশ্বরাজনীতি এবং আন্তর্জাতিক ভাবমূর্তিঃ
বাংলাদেশ বিদেশী সাহায্যের ওপর নির্ভরশীল। আমেরিকা বা ইউরোপের এক শতাংশ লোক বাংলাদেশের নাম শুনেছে কি না সন্দেহ আছে। ইটালীতে বাংলাদেশীরা নিজেদের পরিচয় দেয় ইন্ডিয়ানো বা ইন্ডিয়ান হিসাবে-কারণ বাংলাদেশ কেও চেনে না।

আমি ভারতীয় বলে , আমেরিকানদের কাছ থেকে যে সন্মান, পরিচিতি বা ট্রেডমার্ক পাচ্ছি সেটাতো বাংলাদেশী হলে পেতাম না। কোন স্বাধীন পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা হলেও পেতাম না। সেটা অন্যান্য বাঙালীদের জন্যও সত্য। বাংলাদেশীরা যতই ভারতের বিরোধিতা করুক, কেও যখন জিজ্ঞেস করে দেশটা কোথায়, তখনতো সেই ভারতের পাশে বলেই চেনাতে হয়!

বিশ্বরাজনীতি নিয়ে কি ই বা বলা আছে? রাজনীতি নিয়ন্ত্রন করে বিশ্ববাণিজ্য। ভারতের মাধ্যমে বাঙালী, বিশ্বরাজনীতিতে নিজের বক্তব্য রাখবে, সে আশা খুব ক্ষীন। আর বাংলাদেশকে তো কেও চেনেই না! ফোর্বসে ৭৬৮ জন বিলিয়ানারের মধ্যে যাদের একজনও নেই, তাদের বক্তব্য বিশ্বরাজনীতি তে কে শুনবে?

যাইহোক, বাঙালী হিসাবে আবেগ থাকা ভালো। ন ইলে ভাষাটা টিকবে না। কিন্তু ব্যাপারটা এমন ফালতু না হয়ে দাঁড়ায় যে দেশের অর্থনৈতিক দুর্দশার কারণে বিদেশের নাগরিকত্ব নিয়ে বলতে হয়, আমরি সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি! এটা হিপোক্রাসি। নির্ভেজাল দ্বিচারিতা। বাংলা সোনার হলে, আমরা কেউই আমেরিকায় আসতাম না।

সোনার বাংলা বলে আবেগে না ভেসে, দারিদ্র্য কবলিত বাংলাকে, সোনার বাংলায় রূপান্তরিত করা হোক আমাদের সাধনা।